দৈনিক ইনকিলাব

ড. তারেক শামসুর রেহমান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি ভালো নয়

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশের বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব খবরা-খবর আসছে তা কোন আশার কথা বলে না। গত ২৩ মার্চের খবর ঃ শিবির শিক্ষক-কর্মকর্তাদের লাগাতার অবস্থান ধর্মঘট; ডিসি, অবরুদ্ধ। এর আগের দিনের খবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। সেখানে ডিসি, প্রো-ভিসি আর ট্রেজারারের পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। এ দাবীকে কেন্দ্র করে সেখানে শিক্ষক সমিতি ভেঙ্গে গেছে। ১৮ মার্চের খবরঃ দিনাজপুর হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের লাঠিচার্জঃ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও একটি খবর আছে ১৯ মার্চের পত্র-পত্রিকায়। তাতে বলা হয়েছে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের রেশ ধরে সেখানে লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়া হয়েছে। সেখানে ছাত্ররা শিক্ষকদের চারটি গাড়ী ভাংচুর করেছে-এমন খবরও আছে পত্র-পত্রিকায়। এসব খবর গত এক সপ্তাহের। এর আগে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও একটি খবর ছাপা হয়েছিল। উক্ত খবরে বলা হয়েছিল ছাত্রদলের ছেলেরা ভিসির পদত্যাগ দাবী করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিও খুব ভালো নয়। ধারণা করছি একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বাকী প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সমস্যা রয়েছে এবং সেখানকার ভিসিরা একটি অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে আছেন।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের খবর কোন আশার কথা বলে না। বিশেষ করে যখন প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বা হয়েছে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হওয়া যেকোন অভিভাবকের জন্য উদ্বেগের কারণ বৈকি। এ ধরনের পরিস্থিতি তো উচ্চ শিক্ষার জন্য মঙ্গল নয়। এ ধরনের পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে এবং সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন, তাহলে আগামীদিনের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। শিক্ষার্থীরা এক সময় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সে অর্থে এখনও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। সে কারণে শিক্ষার্থীরা এখনও সেখানে তেমনভাবে ভিড় করছেন না। তবে দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি রিতিমত গর্ব করার মত। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েই ভর্তি হতে হয়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটাই প্লাস পয়েন্ট। সেখানে কোন ছাত্র বা শিক্ষক অসন্তোষ নেই। এ দেশের শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ তখন ভারতে যায়। এটাও একটা কারণ। এখানের 'শিক্ষাজট' এড়াতে অনেকেই ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। ভারতে তো আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসন্তোষ নেই? সেখানে ছাত্র ধর্মঘটের খবর কদাচিৎ আমরা পত্র-পত্রিকায় পাই। কিন্তু শিক্ষকদের কারণে কিংবা অফিসের কর্মচারিদের কারণে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন বন্ধ থেকেছে। এমন ধরনের খবর আমাদের কাছে জানা নেই।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি উদ্বেগের খবর কিছুদিন আগে আমরা পত্র-পত্রিকায় পড়েছিলাম। সাধারণ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে 'মৃত্যু' ঘোষণা করে একটি কফিন মিছিল বের করেছিল সেখানে। ছাত্র-ছাত্রীরা কতটুকু অসহায় হলে তারা কফিন মিছিল বের করতে পারে! তারা তো পড়তে এসেছেন। পড়াশুনাই তাদের কাম্য। কিন্তু শিক্ষক রাজনীতির তারা শিকার হয়েছেন। শিক্ষক সমিতি সেখানে আলটিমেটাম দিয়েছে। সেখানে গঠিত হয়েছে লিয়াজোঁ কমিটি। সেখানে শিক্ষক তথা কর্মচারিদের কিছু দাবী-দাওয়া আছে। কিন্তু সেসব দাবীকে সামনে রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনকে জিম্মি করা কেন? ভিসি সাহেব একবার বলেছিলেন শিক্ষক সমিতি ট্রেড ইউনিয়নের মত ব্যবহার করছে। উপাচার্য কি মিথ্যা বলেছেন কিছু? শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে যেভাবে দাবী-দাওয়া আদায় করে নেয়, আমাদের মত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কি উচিত সে ধরনের আচরণ করা? নিশ্চয়ই নয়। আমরা যারা শুভ বুদ্ধির মানুষ বলে নিজেদের দাবী করি, আমাদের আচরণে এমন কিছু থাকা উচিত নয়-যাতে করে মানুষ প্রশ্ন করতে পারে। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের দাবী-দাওয়া আদায় করবো। কিন্তু সেই পথটি নিয়ে যেন কেউ প্রশ্ন না তোলে। বিশৃংখলতা আর মাস্তানী নির্ভর যে শ্রমিক রাজনীতি, সে ধরনের রাজনীতির সাথে আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের জড়িত করতে পারি না।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে পারে। প্রশাসনের তিন ব্যক্তির পদত্যাগ দাবী করেছে শিক্ষক সমিতি। ক্লাস নেয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি। যে কারণে শিক্ষক সমিতি ভেঙ্গে গেছে। শিক্ষকদের একটা অংশ ক্লাস নিচ্ছেন সেখানে। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি কি আদৌ কাম্য? উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারারকে নিয়োগ দিয়েছেন সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট অনুযায়ী সিনেট একটি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করবে ও সেখান থেকে চ্যান্সেলর একজনকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এ ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে, তাহলে সংগত কারণেই সিনেট অধিবেশন আহবান করা পিছিয়ে যেতে পারে। আমরা নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট অনুযায়ী উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন চাইবো। কিন্তু সেইসাথে এটাও চাইবো সর্বক্ষেত্রে যেন এই এ্যাক্ট পালিত হয়। আর শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে; (১) উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ এবং উপাচার্য হতে আগ্রহী শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তি স্বার্থে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের 'জিম্মি' করে রাখছেন, (২) শিক্ষক সমিতি সাধারণ শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের চাইতে, অন্য বিষয়গুলোকে প্রাধান্য করছে, (৩) ছাত্র রাজনীতিতে সহিংসতা প্রকাশ পাচ্ছে, (৪) কোথাও কোথাও ছাত্র নেতারা ব্যবহৃত হচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চিত্র। সুতরাং সরকারের নীতি-নির্ধারকদের আজ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এভাবে চলতে দেয়া ঠিক কিনা।

ছাত্রদের জিম্মি করা ঠিক হবে না। শিক্ষক হিসেবে আমার নৈতিক দায়িত্ব ক্লাসে যাওয়া, আমার ছাত্রদের কাছে যাওয়া। এই দায়িত্বটুকু আমি পালন করতে চাই। আজকে যারা শিক্ষক আন্দোলনের সাথে জড়িত, তারা সবাই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। ছাত্রদের পড়ানোর অধিকারটুকু আপনারা আমাদের নিশ্চিত করবেন-আমাদের প্রত্যাশা এটাই।

এদিকে দিনাজপুরের হাজী দানেশ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। সেখানে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাংচুর করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এতে করে লাভ হল কার? এটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। শুরুতেই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়, তাহলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাল কথা নয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী-দাওয়া থাকতেই পারে। বুঝতে হবে এসব দাবী-দাওয়া সরকারের পক্ষে কতটুকু বাস্তবায়ন সম্ভব। ছাত্র বেতন বাড়ানো অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। এ যুগে ৬ টাকা সিট ভাড়া, আর ৮ টাকা টিউশন ফি দিয়ে পড়াশুনা করার চিন্তা করা উচিত নয়। দাবী আদায়ের নামে বিশৃংখলতা সৃষ্টি করার নাম আর যাই হোক ছাত্র রাজনীতি হতে পারে না। যে পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেল, তা কাম্য নয়। আজ ছাত্র, শিক্ষক তথা স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদেরকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি রক্ষার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার পেছনে যে কারণটি কাজ করছে, তা হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি তথা কর্তৃত্ব করার প্রবণতা। এই কর্তৃত্ব করার প্রবণতার কারণে প্রায়শই সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ চিত্র পুরনো। অনেকের এতে গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্ররা। তাদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে; (১) উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ এবং উপাচার্য হতে আগ্রহী শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তি স্বার্থে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের 'জিম্মি' করে রাখছেন, (২) শিক্ষক সমিতি সাধারণ শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের চাইতে, অন্য বিষয়গুলোকে প্রাধান্য করছে, (৩) ছাত্র রাজনীতিতে সহিংসতা প্রকাশ পাচ্ছে, (৪) কোথাও কোথাও ছাত্র নেতারা ব্যবহৃত হচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চিত্র। সুতরাং সরকারের নীতি-নির্ধারকদের আজ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এভাবে চলতে দেয়া ঠিক কিনা। সরকার উপাচার্যদের নিয়োগ দিয়েছেন। কোথাও কোথাও এই উপাচার্যদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন সরকারী দলের সমর্থকরা। সরকার কি বিষয়টি জানেন? সরকারের সমর্থক দাবী করে যারা আজ সরকারী সিদ্ধান্তকে বাতিল করার আন্দোলনে নামছেন, তারা কি প্রকারান্তরে, সরকারকে চ্যালেঞ্জ করছেন না? ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট নিয়ে কথা উঠেছে। কথা উঠেছে এই এ্যাক্টের কোন কোন ধারা পরিবর্তন করে সময়োপযোগী করা উচিত। একাধিক সেমিনারে এ কথা উচ্চারিত হয়েছে। এটা নিয়ে সময় যত ক্ষেপণ করা হবে, ততই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিতিশীলতা আরো বাড়বে। উপাচার্যের জন্য প্যানেল নির্বাচন গণতন্ত্র সম্মত, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু এই গণতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়ানো কিংবা সুষ্ঠু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কোন অবদান রাখতে পারছে না। এটা আমেকেই স্বীকার

তারিখ ... 27 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...